ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

রাজশাহীর মেয়েলি গীতঃ বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন

*প্রফেসর মোসাঃ মনোয়ারা খাতুন

সারসংক্ষেপঃ হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার নানা শাখায় বিভাজিত। লোকসাহিত্য এমন বিভাজনের অন্যতম বিষয়। লোকসাহিত্যের বিশাল অঙ্গনে মেয়েলি গীত সগৌরবে বিদ্যমান। সাহিত্যের বিচিত্র বিষয় বিধৃত হয় মেয়েলি গীতে। নারীরা সমাজের ধারক ও বাহক। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সমাজের যাবতীয় কার্যক্রম। তাইতো অনিবার্যভাবে প্রবন্ধে উঠে এসেছে রাজশাহী অঞ্চল তথা বাঙালির সামগ্রিক জীবনচেতনা। অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রাধান্য দেয়ায় এখানে অত্র অঞ্চলের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ যাবতীয় বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

লোকসঙ্গীত গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে রচিত বলেই এতে একদিকে আঞ্চলিক মানস সংগঠন ও অন্যদিকে পল্লীগায়কের চতুঃপার্শ্বস্থ পরিবেশগত ধ্যান-ধারণার পরিচয় সুস্পষ্ট। রাজশাহী অঞ্চলের মেয়েলি গীত এ দ্বিবিধ শর্ত নিয়ে বিদ্যমান। কোন সাহিত্যই যেমন তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশকে অতিক্রম করতে পারে না– লোকসঙ্গীতও তদ্রুপ। তাই, মেয়েলি গীতে আমরা পাই মেয়েলি মনের নানাবিধ অভিব্যক্তির রূপায়ণ। মেয়েরা যেহেতু কাজে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত সেহেতু সংসার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার রচনায় প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। আর সে জন্যই মেয়েলি গীতে সমাজের বিভিন্ন অবস্থার সাথে সাথে অর্থনৈতিক জীবনের সার্বিক রূপ বিদ্যমান। তৎকালীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাবিকাঠি ছিল কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য। যেহেতু রাজশাহী বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য এলাকা সেহেতু এখানকার মেয়েলি গীতেও এর সমর্থন লক্ষ্য করা যায়।

জনজীবনের অর্থনৈতিক অবস্থায় কৃষির প্রভাব অবিসংবাদিত। তৎকালীন গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ছিল কৃষি। বাঙালির লোক-জীবন প্রাচীনকাল থেকে কৃষি নির্ভর। প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিকাজ জীবিকার অন্যতম উপায় হিসেবে চলে আসছে।[১] আধুনিক শহরায়ন জীবন ব্যবস্থায় শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য জীবিকার পথ হলেও বৃহত্তর গ্রামীণ জীবন কৃষির মাধ্যমেই জীবিকা অর্জন করে আসছে। ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প ও আঞ্চলিক ব্যবসায়ের দ্বারা কিছু সংখ্যক পল্লীবাসী জীবিকার্জন করলেও তা' কৃষির প্রভাবমুক্ত নয়। ব্যবসায়ের মূলপণ্য কৃষিজাত দ্রব্য। তাঁতির তুলা, জেলের সুতা, তেলির তিল-সরিষা আসে কৃষকের ঘর থেকেই। অতএব, কৃষি হচ্ছে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জীবিকা নির্বাহের পথ।

বৃহত্তর রাজশাহীর উর্বর মাটিতে প্রায় সব ফসলই ফলে। যেমন– ধান, গম, যব, ভূট্টা, তুলা, বাজরা, পাট, শন, তিল, তিসি, সরিষা, মুগ, মসুর, মাষকলাই, অড়হর, ছোলা, মটর, খেসারি, হলুদ, মরিচ, আদা, ধনে, রসুন, পেঁয়াজ, জিরা, আলু, বেগুন, সীম, বরবটি, টমেটো, কপি, পটল, করলা, তরমুজ, ফুটি, উচ্ছে, মিষ্টি আলু, আখ এবং আরো অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এগুলো ছাড়াও জন্মে– আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, তাল, বেল,

* অধ্যক্ষ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নারিকেল, পান, কুল, তেঁতুল, জামির, লেবু, কলা, পেঁপে, ইত্যাদি। এ ছাড়াও বহু মূল্যবান বৃক্ষরাজি ছিল এতদঞ্চলের প্রায় সবখানে।

বাংলার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ধান। কারণ ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য। ভাত যেমন অদ্যাবধি বাঙালির প্রধান খাদ্য এখানকার মানব সভ্যতার বোধনযুগেও তাই ছিল বলে মনে হয়।[২] কারণ, মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকে লিখিত শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্ড্রনগরে একটা ধানভাণ্ডার ছিল।[৩] ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য হওয়ায় কৃষকেরা অন্য ফসলের তুলনায় ধান উৎপাদনে গুরুত্ব দিতো বেশি। রাজশাহী যেহেতু বাংলার বিশিষ্ট এলাকা সেহেতু এখানকার কৃষকেরা ধান উৎপাদনে বেশি গুরুত্ব দিতো– এটাই স্বাভাবিক। ধান ছিল চার প্রকার– আউশ, আমন, বোরো ও ইরি।[৪] তাদের উৎপাদিত এই চার প্রকার ধান আকৃতি-প্রকৃতিতে ছিল বিভিন্ন শ্রেণির, স্বাদে-গন্ধে ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং মোটা-সরু ও অন্যান্য গুণের তারতম্যে ধানের জাত ছিল অসংখ্য প্রকারের।[৫] যেমন– ঝিঙ্গাশাইল, লতিশাইল, সোনাশাইল, কুসুমশাইল, বাতরাজ, গুয়াশালী, ঘিশালী, পুয়াখুপি, মাগুরশাইল, মৌভোগ, গন্ধেশ্বরী, রান্ধনীসুন্দর, মউলতা, লক্ষ্মীভোগ, পারিজাত, দুধশাইল, রান্ধনীপাগল, পঙ্খীরাজ, রাজভোগ, বাঁশফুল, মালশারা, মুগী, সাহেবগজা, ইন্দুরশাইল, ইন্দ্রশাইল, ভাষামাণিক, দুধকলস, হড়মাফারাম, আলতামুখী, কাজলমুখী, কালীরায় ইত্যাদি।

জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন ধানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। সে কারণে মেয়েলি গীতেও এর প্রসঙ্গ এসেছে স্বাভাবিকভাবে। যা আমরা নিম্নের সঙ্গীতগুলোতে লক্ষ্য করি:

এক. 'কাহাবা পাবো হামি
চিনি আতপ ধান রে
মার দোবলা রে।'

দুই. এক ধামা ধানরে দুলোব এক পাহাড়ে বাহানে রে
দুলোর রে সুন্দরী।'

তিন. 'এক ধামা ধান দুবলা এক পায়ে বানে লো
ও সুন্দরী আমার দুবলা লো।'

আবার, ধান গাছের খড় বা বিচালীর কথা বিভিন্ন মেয়েলি গীতে বিদ্যমান–

এক. 'গলতে আছে পুয়ালের পালা
স্বামী আমার গলার মালা
ও সাধের ননদী
ননদীর ভাই কেন বিদেশী।'

দুই. 'আইলস্যা খড়ির জ্বালরে রাইমন
ভাত ভাল রান্ধে রে
সরাই ভাঙ্গল সোনার রাইমন রে।'

তা ছাড়া, ধান ভেঙ্গে চাউল করার সময় যে তুষ বা গুঁড়া হয় তার উল্লেখ মেয়েলি গীতে বিদ্যমান-

'লিল্লা গুঁড়ার রুটিরে দুলোব ধইস্যা ধইস্যা পড়ে রে
দুলোব রে সুন্দরী।'

ধান ছাড়া উৎপন্ন হতো গম, যব, চীনা, ভূট্টা, ইত্যাদি যা' অর্থনীতিকে করতো শক্তিশালী। মধ্যযুগেও এ দেশে গম চাষ ছিল যদিও ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও গোলাম হোসেন সলীম বাঙালিরা গম খেতো না বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] কিন্তু এ তথ্য যথার্থ নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে।[৭] নিম্নের গীতটিও তার স্বাক্ষর বহন করে:

'লিল্লা গহামের রুটি
পাইঠের লাহারী।'

আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা শন, পাটের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উল্লেখ্য যে, এ দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে পাটের চাষ শুরু হয়।[৮]

'বৈঠক যোগানী পাট কাটানী শ্বশুরজী
একবার যাইতুং লাইহরে।'

খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ দেশে ইক্ষু চাষ প্রচলিত হয় বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।[৯] ইক্ষু বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনে সম্মোহক প্রভাব বিস্তারকারী এক অর্থকরী কৃষিদ্রব্য– যার উল্লেখ মেয়েলি গীতে অনুপস্থিত নয়:

'খাবো না খাবো নারে
কালো গুড়ের ক্ষীর খাবো নারে।'

উপরিউক্ত কৃষিজাত দ্রব্যাদি ছাড়াও উৎপন্ন হতো সরিষা, তিল, ভুরা, বাজরা, চীনা ইত্যাদি। যেমন–

'আনো আনো সরিষা বলদে ভরিয়া
ঐ না সরিষা উদরামো রে বহুলে বসিয়া।

দেশে হলুদ, মরিচ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, ধনে, জিরা, ইত্যাদি নানা প্রকার মসলার চাষ হতো। গ্রাম বাংলায় মসলার উৎপাদন প্রচুর ছিল বলে মেয়েলি গীতে উল্লেখ আছে:

এক. 'হলদি মেহেন্দী বাটিতে রে
লইড়্যা গ্যাল পাটা।'

দুই. 'মুখে না হলৈদ রে বাছা
গোটা আরো গোটা
গায়ে না হলৈদ রে বাছা
সর্ব্ব রঙের ফোঁটা।'

তিন. 'ইলিশ মাছ উঠিয়া বলে
আমার শিরা রান্ধিতে গেলে
লাগে হীরাপুরের জিরা
মাছ ইলিশা রে।'

চার. 'খলিশা মাছ উঠিয়া বলে
আমার গাদা রান্ধিতে গেলে
লাগে মোহনপুরের আদা

মাছ খলিশা রে।'

গ্রামীণ বাংলার উক্ত এলাকায় কিছু সংখ্যক লোক পান চাষের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করতেন এবং এখনও করছেন। যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় নিচের গীতে–

'আইবারীর মুখে নাইগো পান
আইবারী ভাবিতে ভাবিতে যায়
গলতে আছে আলুর পাতা
আইবারী পান বুইল্যা খায়।'

গ্রাম বাংলায় আরো উৎপন্ন হতো বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি। কিছু মেয়েলি গীতে এর উল্লেখ বিদ্যমান–

ননদ গ্যাছে শাগ তুলিতে
আল্লাহ কইর‍্যা ধরা পইড়্যা যায়
বাখোর রে হামার গা জুড়িয়া যায়।'

বৃক্ষলতা শোভিত গ্রাম বাংলার সবুজ মনোহর পরিবেশে কত যে বিচিত্র স্বাদ-গন্ধের ফল ফলতো তার ইয়ত্তা নেই। আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল, বেল, জামির, কলা, পেঁপে, লেবু, লিচু, কদম, তেঁতুল এবং আরো বিভিন্ন প্রকার ফল গ্রাম বাংলায় প্রায় সর্বত্রই জন্মাত–

এক. 'আমের না দুধের রে বাছা
রাইন্ধাচি ক্ষীর ও
খাও না খাও রে বাছা
বাপের হাতের ক্ষীর ও।'

দুই. 'বাতাস নাইক বুন্দি নাইক
কদম দোলে ডালে রে।'

তিন. 'নয়া গাছের নয়া ব্যাল বাদশারে
হাতে নাহি ধরে বাদশারে
সোনার বাদশা সোনার রানি রে।'

চার. 'মা গড়ায় নারকেলের লাড়ু
চাচী আওটে দুধ।'

পাঁচ. 'হামার তিন মাসের গর্ভ হইচে ও রাজা
হামার তেঁতুল খেতে মন গিয়েছে ও রাজা।'

ছয়. 'ঐখানে থুইয়্যাছিনু মাথোল–
ঝাঁকড়া নেমুর তলে রে
মাথোল গ্যাল চোরে।'

সাত. 'ক্যালার গাছে কালো পিঠা নামবে কি না
শ্বশুরকে কইহ্যা আইসো গা
কালো জামাই লিবে কি না।'

এ ছাড়া নানা জাতের বৃক্ষ এ দেশের অর্থনীতিকে যুগে যুগে করেছে স্বচ্ছল। যেমন–

'কানটাতে না আছে রে মারে
আইকোড় পাইকোড় গাছি নারে।'

বাংলাদেশের এক পুরাতন কৃষিজাত উপকরণ রেশম, যার মাধ্যমে এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যুগে যুগে সজীবতা লাভ করেছে। এক সময় প্রচুর পরিমাণে রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হতো। তখন বাংলাদেশ রেশমের গুদামঘর বলে পরিচিত ছিল।[১০] অনেকে বলে থাকেন পুণ্ড্রবর্ধন আমলে এ দেশে রেশমের চাষ হতো।[১১] রেশম প্রাচীনকালে বাংলায় আসে চীন থেকে তিব্বতের মাধ্যম হয়ে।[১২]

রাজশাহী এলাকার এক বিরাট অংশ অদ্যাবধি রেশম ও রেশম শিল্পের উপর নির্ভরশীল। এর প্রমাণ রাজশাহীর ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, চারঘাট ও পবা উপজেলা।[১৩] দেশের প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার গ্রামীন মানুষ রেশমের উপর নির্ভরশীল।[১৪] রেশম ছাড়া বস্ত্র তৈরির জন্য একদা এতদঞ্চলে কার্পাসের চাষ করা হতো। বর্তমানেও কার্পাসের চাষ হয়, তবে পূর্বের মতো তত ব্যাপক নয়। কার্পাস তুলা থেকে গ্রামের মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি তৈরি করে নিতো।

এক. 'লাল সুতা নীল সুতা
রেশমী সুতার গামছা লো
ও মন মাছ্যানী লো।'

দুই. 'আলমের পরনে
রেশমের ধুতি আরম
দুরে যাইয়্যা ফরকাই ও হে আলম
কাঁচা বাঁশের তলে।'

কৃষকেরা বাড়ি-ঘর তৈরিতে ছাউনীর কাজে ব্যবহারের জন্য খড়ের চাষ করতো–

'আষাঢ় শাওনে উলা ফলিল হে
ভরা ভাদরে কাইশ্যা কাটিল হে।'

উপরিউক্ত সামগ্রীর পাশাপাশি রাজশাহীর কিছু এলাকায় চাষ হতো গাঁজার। বিশেষ করে নওগাঁ জেলায় গাঁজার চাষ[১৫] প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।

'আটে আটে রাহেলা গাঞ্জা লিবিটে
গাঞ্জা বিকাইতে আইস্যাছে।'

অনাবৃষ্টির জন্য অনেক সময় ফসলের ভীষণ ক্ষতি হতো। এই অনাবৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য সেচের ব্যবস্থা করতো। কিন্তু কৃষি ব্যবস্থা গতানুগতিক হওয়ার দরুন সেচ ব্যবস্থাও ছিল সনাতন।[১৬] তাই, তারা সেচের মাধ্যমে ক্ষেতে পানির ব্যবস্থা করলেও শেষ রক্ষা হতো না। কারণ পুকুর, খাল, বিলের পানিও খরার দরুন শুকিয়ে যেত। তা ছাড়া, সবক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা করতে পারতো না। তাই, দেখা যেত অনাবৃষ্টির সময় গ্রামীণ মহিলাসমাজ বৃষ্টি কামনা করে ব্যাঙ বিয়ে, বদনা বিয়ে, পুতুল বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করতো।

'মাচার তলে কোলা ব্যাঙ
দক্ষিণে মেলিছে ঠ্যাঙ
বড় যতনের ব্যাঙ রে।'

যাহোক, বাংলার কৃষকগণ এ দেশের উর্বর মাটিতে প্রচুর ফসল ফলাতো কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এ ফসল ভোগ করতে পারতো না। কারণ, অধিক সংখ্যক কৃষকের নিজস্ব জমি ছিল না, তাই তাদের উৎপাদিত ফসলের সিংহভাগ চলে যেত জমিদার, ভূ-স্বামীদের হাতে। এখানে জমি চাষাবাদের ক্ষেত্রে মালিকানার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার চাষাবাদ পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়।

(১) আংশিক জমি চাষাবাদকারী কৃষক: যারা তাদের মোট জমির অংশ বিশেষ নিজেরা চাষ করে এবং বাকী অংশ বর্গা বা খাজনার মাধ্যমে অন্যদেরকে চাষ করতে দেয়।

(২) নিজ মালিকানাধীন চাষাবাদ: এখানে জমির মালিক সমগ্র জমি নিজেই চাষ করে থাকে।

(৩) রায়ত ও বর্গাচাষ: এখানে জমির মালিক নিজে কোন চাষাবাদ না করে খাজনা বা বর্গার মাধ্যমে অপরকে (কৃষককে) চাষাবাদের জন্য দেয়। উল্লেখ্য যে, রায়ত বা বর্গাচাষ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার সময় মালিক ও কৃষকের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এতে দু'জনের মতামতের উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত হয় কৃষক মালিককে জমির উৎপাদিত ফসলের অংশ বিশেষ দিবে কিংবা টাকা দিবে। ফসল দিলে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দিতে হয় এবং টাকা দিলে তা' আলোচনা সাপেক্ষে স্থির হয়।[১৭]

চাষাবাদ পদ্ধতির বৈষম্যের জন্য কৃষককুল উৎপাদিত পণ্যে সবটুকু ভোগ করতে না পারলেও তারা অভাবগ্রস্ত ছিল না। গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ– অর্থাৎ সেকালের মানুষের প্রাচুর্য ছিল। তাই দেখা যায়, তারা বিয়ে, খাতনা, নামকরণ বা আকিকা, মুখে ভাত বা অন্নপ্রাশন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালন করতে পারতো। প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনকে আপ্যায়ন করতো এবং বিয়েতে প্রচুর পরিমাণে যৌতুক হিসেবে উপঢৌকনাদি দিতে পারতো। নিচের মেয়েলি গীতে এর পরিচয় বিদ্যমান :

এক. 'গাই দিয়াছি বাছুররে দিয়াছি
রাখাল দিয়াছি সনে আরে রাখাল দিয়াছি সনে।'

দুই. 'বাপের মোড়লী করা টাকা দ্যাহাজে পাব
তবে না খাব রে হামি বাপের হাতের ক্ষীরও।'

তিন. 'গোলা ভরা ধান রইল শ্যাম
ফকির বিদায় করিও হে পানের পান
কুঠি ভরা চাল রইল শ্যাম
দশকে খিলাই ওহে পানের পান।'

মেয়েলি গীতে আর্থিক জীবনের অপরদিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের উল্লেখ যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল দু'ধরনের– অন্তঃবাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য। অন্তঃবাণিজ্যে বণিকগণ তাদের ব্যবসায়কার্য নিজ গ্রামে থেকে কিংবা দেশের মধ্যে পরিচালনা করতো, কিন্তু বহির্বাণিজ্যে যেত বেশির ভাগ সময় দূর দেশে এবং দীর্ঘদিনের জন্য। বহির্বাণিজ্য ছিল নৌ-নির্ভর। দেশে প্রচুর পরিমাণে সুতি ও রেশমী বস্ত্র তৈরি হতো,

উৎপন্ন হতো পর্যাপ্ত ফসল। দেশে উদ্বৃত্ত ফসল ফলতো বলেই সাধু সওদাগর ও ব্যাপারীরা হাজারো রকমের তেজারতি দ্রব্যে নৌকা বোঝাই করে বছরের বিশেষ একটা সময়ে সাধারণত কয়েকজন মিলে একসঙ্গে বাণিজ্যে যাত্রা করতো। বাণিজ্যে যাবার দিনটিতে সারা গ্রামে সাড়া পড়ে যেত। চারিদিকে সাজ সাজ রবের মধ্যে শুধু একটি কথাই যেন শুনতে পাওয়া যেত– বাণিজ্যে চল, বাণিজ্যে চল। বাণিজ্য শেষে প্রচুর অর্থ সামগ্রীর সম্ভাবনায় কেউবা উৎসব মুখর, কেউবা দীর্ঘদিনের জন্য প্রিয়জন বিচ্ছেদের বেদনায় বেদনার্ত হয়ে উঠতো। স্বামী তার স্মৃতি ধারণের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর কাছে রেখে যেতো জুতা, গামছা, ইত্যাদি। যা দেখে স্ত্রী ভুলে থাকবে স্বামীর বিরহ বেদনা।

'ব্যবসায় যাচ্ছেন বাণিজ্যে যাচ্ছেন
নাগর জুতা জোড়া রেখে যাবেন ঘরে।
তোমার কথা মনে পড়লে নাগর
জুতা জোড়া দেখে রব ঘরে।'

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, ইত্যাদি এলাকা রাজশাহীর (উত্তরাঞ্চলের) পশ্চিম দিকে অবস্থিত।[১৮] এখানকার বণিকেরা সাধারণত পশ্চিম অঞ্চল এবং কখনো কখনো পশ্চিম অঞ্চল পার হয়ে আরো দূর অঞ্চলে যেতো বাণিজ্য করতে। কারণ পশ্চিমের দেশগুলো ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল আর সে দেশের রমণীরা অপূর্ব সুন্দরী।[১৯] তাই ভয়- সওদাগর স্বামী যদি দ্বিতীয় স্ত্রীসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এই আশংকায় স্ত্রীর হৃদয় সদা শঙ্কিত থাকতো। কখনো কখনো প্রবাসী স্বামীর দ্রুত প্রত্যাবর্তন ও উপহার সামগ্রীর আশায় স্ত্রীরা উদগ্রীব থাকতো–

'আমার স্বামী গেছে
হুগুলী জেলায় বাণিজ্যেরে লাল
ধীরে ধীরে।
সেখান থেকে আনবে স্বামী
মনিপুরী পাশারে লাল
ধীরে ধীরে।'

রমণীদের প্রাপ্ত উপহারের মধ্যে থাকত কাঁচা পাটের শাড়ি, ঢাকাইয়া শাড়ি, গাছা পাইড়া শাড়ি, ঢাকাইয়া সিঁদুর, রেশমী চুড়ি, আয়না, কাঁকই, আবের পাঙখা, নাকের নোলক, কানের দুল, গলার মালা, কোমরের বিছা, পায়ের মল, খাড়ু, হাতের বালা, বাজু, লাল গামছা, জরির ফিতা ও আরো নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী। এগুলোর তারতম্য ঘটতো স্বামী, পুত্র, ভ্রাতার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার উপর ভিত্তি করে।

যাহোক, তখনকার দিনে এক শ্রেণির লোক এভাবে বছরের পর বছর ধরে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে জীবিকার্জনের প্রয়াস পেত। এ তো গেল উচ্চ শ্রেণির ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা। কিন্তু পাশাপাশি নিম্নশ্রেণির সমাজের পুরুষ মহিলারাও নিজের গ্রামের মধ্যে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টা চালাতো–

এক. 'দইও খানি লিয়া রে ঘোষাইন
লম্বা সরাণ ধরে আরে কে।'

দুই. 'সেও পোহনা লিয়া মাছ্যানী
মাছ বেচিতে যাইও লো
ও মন মাছ্যানী লো।'

সমাজে ক্ষৌরকার, পানের দোকানদার এবং নিম্নশ্রেণির মৎস্য ব্যবসায়ী ছিল। ক্ষৌরকার ক্ষৌরকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো–

'ভালো করে করেন গো খেউড়ি
ও বিন্না বাড়ীর নাপিত হে।'

সে আমলেও আজকের মতো অনেকে পানের দোকান দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো–

'শিগগির কইর‍্যা দ্যাও প্যানাতি ভাই
ছাঁচি পানের খিলি আরে ঐ যে
ছাঁচি পানের খিলি না।'

মৎস্য শিকার ছিল গ্রামীন জীবনের আর একটি জীবিকা নির্বাহের সহজ পথ। এটি আজও বিদ্যমান। খাল-বিল-নদী-নালায় ভরপুর এই বাংলাদেশের মৎস্য শিকার যে জীবিকা নির্বাহের একটি স্বাভাবিক পথ হবে তা' আশা করা বাহুল্য হবে না। আজকের মতো সেকালেও গ্রাম বাংলার মানুষ মাছ ধরতো। এই মাছ ধরার কাজে তারা ব্যবহার করতো হাতজাল, বেড়াজাল, হ্যাংগার, পলুই, দাড়কি, কোঁচ, জিপ ইত্যাদি। মৎস্য শিকার করে মেয়েরা গ্রামে গ্রামে ফেরি করে মাছ বিক্রয় করতো– তার উল্লেখ আছে মেয়েলি গীতে।

'সেও পোহোনা লিয়া মাছ্যানী
মাছ বেচিতে যায় ওলো
ও মন মাছ্যানী লো।'

এ ছাড়াও মেয়েরা গঞ্জিকাবৃত্তি, দাসীবৃত্তি, বেসাতিবৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহের প্রয়াস পেত–

'এতই সুন্দর শালীরে হামার
বাজারে ব্যাচে পান রে
পাইকোড়ের তলে।'

তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের স্থান ছিল অন্যতম। সেকালে বৃহৎ শিল্প কারখানা না থাকলেও ক্ষুদ্র-কুটির শিল্পের অভাব ছিল না। রাজশাহীর জনগণ বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতো শিল্পের মাধ্যমে যে জীবিকা অর্জন করতো তা নিশ্চিত। কারণ, মেয়েলি গীতে এর প্রমাণ মেলে–

'ঠুঁইকা ঠুঁইকা তাঁতা বুনাব
তারে নারে কে।'

রাজশাহীতে মৃৎ-শিল্পের প্রচলন বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় সুপ্রাচীন কালের। কুম্ভকারেরা কাদা-মাটি দিয়ে অতি দক্ষতার সাথে হাঁড়ি-পাতিল, ঢাকনা, কলস, বদনা, সানকি, সখের পাতিল, নানারকম খেলনা তৈরি করতো এবং এ সব বিক্রয় করে উপার্জিত অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো।

'চাক ঘুরি ঘুরি কুমহারিয়া রে
কে দিবে হামার চাকে মাটি।'

অনুরূপভাবে কাঁশারি কাঁসা, তামা ও পিতল দিয়ে থালা, বাটি, কলস, বদনা, চামচ, ঝারি, ফুলদানী, পানদানী, আতরদানী, সুরমাদানী, জগ, গ্লাস ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরি করতো। তামা ও কাঁসা শিল্পের ইতিহাসে রাজশাহীর খ্যাতি সবচেয়ে বেশি ছিল। মেয়েলি গীতেও এর উল্লেখ আছে-

'রাইমন চাহে জোড়ে কলস দানে রাইমন রে
মায়ে বলে দিব রে দিব বাপে বলে কাঁশারি
নামেনি দ্যাশে রাইমন রে।'

কামার লোহা দিয়ে তৈরি করতো বটি, ছুরি, দা, খুন্তা, ফাল, কাস্তে প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস–

'কিবা কাজ কর কামার ভাই
লিচিন্দে বসিয়া আরে ঐ যে
ঠাউরে বসিয়া রে।
শিগগির দাও কামার ভাই
লিল্লা পাখালের ছোরা আরে ঐ যে
লিল্লা পাখালের ছোরা রে।'

স্বর্ণকার সোনা-রূপা দিয়ে নাকফুল, কানফুল, মালা, বাজু, খাড়ু, মল, বালা, চুড়ি ইত্যাদি তৈরি করতো এবং তা বিক্রয় করে উপার্জিত অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো-

এক. আটে আটে মরিয়ম মালা আস্যাছে
তোর উচ্চা গলায় নিচা মালা লে মালা লে।'

দুই. 'কাইলি না সকালে রে হামি
সোনাইরা বসাব
গড়হিয়া না দিব রে হামি
জোড়ে হাতের বালা।'

উপরিউক্ত বৃত্তিজীবী ছাড়াও সমাজে আমরা আরো বিভিন্ন শ্রেণির পেশার মানুষ দেখতে পাই। যারা তাদের পেশায় থেকে কৃষি, ব্যবসায় ও শিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের প্রয়াস পায়। রাজশাহী অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা যে দেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র এবং স্বনির্ভর ছিল– আলোচ্য মেয়েলি গীতগুলো তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তথ্যসূচি:

---

১. ওয়াকিল আহমদ: বাংলার লোক-সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ: ২২১
২. বাংলা একাডেমি পত্রিকা: ষড়বিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮৮, পৃ: ৩১
৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১
৪. শামসুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, রাজশাহী পরিচিতি: প্রথম প্রকাশ, বরেন্দ্র একাডেমি রাজশাহী, ১৩৮৬, পৃ: ২৭৪ ও ২৭৬

৫. মুহম্মদ আবদুল জলিল: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ: ২০৯

৬. (ক) Abul Fazal Allami: The Ain-i-Akbari, Vol. 11, Tr. H. S. Jarret, Revised Edition by Jadu Nath Sarker, Third Edition, New Delhi, 1978, P. 134.
(খ) বাংলাদেশের ইতিহাস রিয়াজ-উস-সালাতিন: (আকবর উদ্দিন কর্তৃক অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ: ১৮
উদ্ধৃত: মুহম্মদ আবদুল জলিল: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১১

৭. মুহম্মদ আবদুল জলিল: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১১

৮. বাংলা একাডেমি পত্রিকা: পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১

৯. বাংলা একাডেমি পত্রিকা: পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১

১০. (ক) Ibid: P. 4-5
(খ) শামসুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, রাজশাহী পরিচিতি: পূর্বোক্ত, ১৩৯৪, পৃ: ৩০৩

১১. রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা: ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ: ৩৬

১২. The Distirict of Rajshahi its Past and Present, Editor, S A Akanda, Institute of Bangladesh Sutdies, Rajshahi University, 1989, P. 290-295.

১৩. রাজশাহী পরিচিতি: শামসুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০৩

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০৩

১৫. রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা: পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১

১৬. (ক) মুহম্মদ আবদুল জলিল: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ, পৃ: ২১৩-২১৪
(খ) শামসুদ্দীন আহম্মদ সম্পাদিত, রাজশাহী পরিচিতি: পূর্বোক্ত, পৃ: ২৮১-২৮২

১৭. এস এম বাসার: অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৮ ইং, পৃ: ২২২-২২৪

১৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলার লোক সাহিত্য, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ: ১৭১

১৯. বাংলা একাডেমি পত্রিকা: পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৬-৬৭